

জোছনাফুল

আবদুল্লাহ মাহমুদ নজীব



জোছনাফুল

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশন্স

জোছনাফুল

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

প্রকাশনায়

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮

guardianpubs@gmail.com

www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক

www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

শব্দ বিন্যাস : গার্ডিয়ান টিম

প্রচ্ছদ : নাসিমা তামান্না

মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস

১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা ম্যানশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ২৫০

পেপারব্যাক মূল্য : ২২৫

ISBN: 978-984-8254-71-4

Josnafool by Abdullah Mahmud Nazib, Published by
Guardian Publications, Price TK. 250 (HC)/TK. 225 (PB) Only.



প্রকাশকের কথা

জোছনার সঙ্গে প্রেম নেই— এমন মানুষ বোধ হয় পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। জোছনার কোমল আলোকে নিয়ে তৈরি হয়েছে কত শত গল্প-কবিতা-প্রেমসুর; আসর জমানো গীত-সংগীত। কোনো কোনো কবির প্রতিভার প্রহর যেন গুরুই হয়েছে জোছনারাতে। কারণ, এই রাতেই ফুল ফোটে গদ্যে-পদ্যে এবং হৃদয়পটের না-বলা কথাগুলোর। মেলা বসে কল্পলোকের দোলায় দুলতে থাকা বনি আদমের।

‘জোছনাফুল’ বইটি ঠিক এমনই কথামালার বুড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে; জোছনার কুণ্ডম-শীতল আলোয় ঝরে পড়েছে নানা রকমের বাক-চিত। বইটির মাধ্যমে পাঠককুল জোছনাস্নাত রাতের নীরবতায় শব্দস্নাত হয়ে হারিয়ে যাবে গভীর স্বপ্নলোকে; সেই স্বপ্নে থাকবে না কোনো কৃতিমতা, থাকবে না কোনো আনুষ্ঠানিকতা; রবে সুপেও-সুমধুর প্রাপ্তির সমাহার।

তরুণ প্রজন্মে কবি আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব ভাইয়ের লেখ্য-বচন নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তার তুলনা তিনি নিজেই। গার্ডিয়ান পাবলিকেশ-এ তিনি ভরসা রেখেছেন— এতেই গার্ডিয়ান পরিবার তৃপ্ত। তার জন্য জোছনা-উজাড় ভালোবাসা।

পাশাপাশি অকৃতিম ভালোবাসা প্রকাশ করছি গার্ডিয়ান টিমের প্রতি; যারা একটি কাক্ষিত পরিবর্তনের নেশায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ আমাদের সকল কর্ম তৎপরতা কবুল করুন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

প্রবেশক

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى من والا، وبعد..

‘চান্নিপসর রাইতে’ দাদুভাইয়ের কাছে গল্প শুনতাম ছোটবেলায়। জোছনারাতে বসে আড্ডা জমানো আর গল্প বলার রেওয়াজ প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। পৃথিবীর যেকোনো ভাষার কথাসাহিত্যের ইতিহাস লেখতে গেলে চাঁদনী রাতে গোল হয়ে বসে শ্রুতকাহিনি শোনানোর ঐতিহ্যটা সর্বাত্মে প্রাসঙ্গিক হয়ে আসে। এই বইটিকে ধরে নিন জোছনা রাতের আড্ডা। পাঠকরা সবাই গোল হয়ে বসে লেখকের কাছে কিছু গল্প শুনছেন। তবে লোককাহিনি নয়, রূপকথার কল্পগল্পও নয়; জীবনের পাঠশালায় শেখা ছোটো-বড়ো কিছু অনুভূতির আলোচনা।

ক্যাম্পাসের কয়েকজন বন্ধু নিয়মিত এমন আড্ডা জমিয়ে বসে। বিশ্বাসী তরুণ তারা, ভালোবাসে কবিতাও। সেই আসরে আমারও ডাক পড়ে। বিশ্বাসের কথা বলি, কবিতার গল্প শোনাই, জীবন-ভাবনার আদান-প্রদান করি। একদিন ইচ্ছে হলো— জোছনারাতে সবাই মিলে নদীতে ভাসব; যেই কথা সেই কাজ, শুষ্কপঙ্কের রাতে সবাই বেরিয়ে পড়লাম। লঞ্চের ছাদে গোল হয়ে বসে চাঁদের সাথে ভাব জমালাম, জোছনাধোয়া নদীর ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের বুকে। জোছনার চাদর গায়ে জড়িয়ে যে গল্প তাদের শুনিয়েছি, অনুভূতির যে স্কেচ তাদের সামনে এঁকেছি, প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টাকে অনুভব করার যে দর্শন খুঁজে বেড়িয়েছি— তারই লিখিত রূপ আজকের জোছনাফুল। চাঁদ আর জোছনা নিয়ে গল্প করতে করতে হঠাৎ মনে হলো— সূর্য যদি অভিমান করে বসে? তাকে নিয়েও একটা আসর বসানো যায়! ব্যস, পরবর্তী আড্ডা হয়ে গেল তাকে নিয়ে। সেই আড্ডা এই বইয়ে সংস্থিত হলো ‘সূর্যশৌর্য’ শিরোনাম নিয়ে। নদীতে ভেসে জোছনাফুল লিখলাম, সাগরে ভেসেও তো কিছু লেখা চাই! সমুদ্রবিহারের ডাক এলো একদিন। সফরটা যাতে সত্যিকারার্থেই ‘শিক্ষাসফর’ হয়, সমুদ্রের নীল রং দিয়ে ভাবনার পোর্ট্রেইট অঙ্কনের একটা পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই ঝিলমিল নীল এই বইয়ে দেখা যাবে ‘নীলমিল’ শিরোনামে।

বইয়ের সবগুলো লেখাই এমনতরো আকস্মিক ভাবনার প্রসারিত রূপ, খামখেয়ালির প্রবর্তন। বিশ্বাসী মানুষ তাদের খামখেয়ালিকেও বিশ্বাসের দর্পণেই দেখে। দর্পণটা চিনিয়ে দেওয়ার বিনীত প্রয়াস আজকের বই।

ইতঃপূর্বে এই ধারায় আরও দুটি বই— শেষরাত্রির গল্পগুলো ও তারাফুল— লেখা হয়েছিল। কিছু পাঠক প্রশ্ন রেখেছেন— একই বইয়ে বিভিন্ন আকারের লেখা মলাটবদ্ধ হওয়া মানানসই কি না।

মানানসই কি না জানি না, তবে আমার কাছে চলনসই। কবিতা যখন লিখি, কখনো দুই পঙ্ক্তিতেই কথা শেষ হয়ে যায়। আবার কয়েকটা কবিতা দুশো লাইনেও শেষ করতে পারিনি। একই কাব্যগ্রন্থে চার লাইনের কবিতা, চোদ্দো লাইনের সনেট, শত লাইনের গল্পকাব্য যেভাবে পাশাপাশি নির্বাঞ্ছাট সংসার পাতে, গদ্যগ্রন্থেও একইভাবে ছোটো-মাঝারি-বড়ো আকারের লেখা একসাথে সংস্থিত করে রাখি। আমি ‘হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল’, সেই কথা কখনো এক পাতায় ফুরিয়ে যায়, কখনও দশ পাতাও লেগে যায়। কলমের সাথে জোরাজুরি করি না; যেখানে সে থামতে চায়, থামিয়ে দিই, যত দূর চলতে চায়, চালিয়ে নিই। ফলে নানাবিধ দৈর্ঘ্যের লেখা এক মলাটে জায়গা পায়।

গল্পগুলো যেহেতু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্চিত ও সিঞ্চিত, ব্যক্তিগত পাঠাভ্যাসের একটা প্রভাব এতে আছে। হৃদয়ের খোরাক পেতে কুরআন পড়ি, পথচলার জ্বালানি সঞ্চয় করি হাদিসের পাতা থেকে, আনন্দ খুঁজে বেড়াই বিশ্বসাহিত্যের নানা অলি-গলি ঘুরে। এই ত্রিমোহনী হাটে যা কিছু কুড়িয়ে পাই, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ও সামষ্টিক আড্ডায় সে সবকিছু বিলিয়ে বেড়াই। নিজে যেসব ভুল করেছি, সেই ভুল থেকে উঠে আসার জার্নিটা শেয়ার করি। পরিবার, শিক্ষায়তন, সাথি-সতীর্থ— যেখানে যা কিছু শিখি, সবকিছু লিখে রাখতে চাই। জোছনাফুল-এর লেখাগুলো এর ব্যতিক্রম নয়। এসবের পেছনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে নবিজি ﷺ-এর একটা হাদিস : ‘মানুষকে যে ভালো কথা বা ভালো কাজ শেখায়, তার ওপর আল্লাহ রহম করেন, ফেরেশতারা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন, আসমান ও জমিনের সব সৃষ্টি— এমনকী গর্তের পিপড়া আর সাগরের মাছও তার জন্য দুআ করে।’^১

আমি আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী, ফেরেশতাদের ইস্তিগফারের আকাজক্ষী, মানুষ ও সৃষ্ট জীবের দুআ পেতে আকুল। এ জন্য নিজের অসংখ্য অসংগতি ও পাপ সত্ত্বেও কাউকে ভালো কিছু জানানো ও শেখানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। প্রবন্ধগল্প ধাঁচের বইগুলো সম্ভবত সেই আকাজক্ষারই ফসল।

এখানকার বেশ কিছু লেখা ইতঃপূর্বে রুগে ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন-সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘আমার অসুখ, ইবন তাইমিয়ার প্রেসক্রিপশন’ শিরোনামের একটি লেখা পাঠকদের কাছে আদৃত হতে দেখেছি। শিরোনামটি বইয়ে খুঁজে না পেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ওটা মূলত ‘বাইশ জানুয়ারি’ শীর্ষক লেখাটিরই একটি অংশ। সম্পাদকদের অনুরোধে নতুন লেখা তৈরি করার সুযোগ পাইনি বিধায় অংশবিশেষ আলাদা শিরোনামের অধীনে সাময়িকীগুলোতে দিয়েছিলাম।

১. সুনানে তিরমিজি : ২৬৮৫

বইয়ের শেষদিকে একটা কবিতা যুক্ত করেছি। বইয়ের অধিকাংশ লেখার ধাঁচের সাথে কবিতাটা প্রাসঙ্গিক মনে হলো, তাই কাব্যের পাণ্ডুলিপি থেকে তাকে এখানে স্থানান্তর করেছি। প্রবন্ধগুলোর বইয়ে পুরোদস্তুর কবিতা তুলে দেওয়া ঠিক হলো কি না, কী জানি! তবে গদ্যের বই হওয়াতে গদ্য-কবিতা একেবারে হয়তো বেমানান হবে না।

প্রিয় পাঠক, আপনার দুআয় লেখককে স্মরণ রাখবেন, ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অবহিত করবেন।

আপনার হৃদয়ে ছড়িয়ে পড়ুক অমৃত জোহনাফুলের সৌরভ।

الفقير إلى عفو ربه

আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব

জানুয়ারি ২৭, ২০২০ ঈসাদ্দ

পদ্মা-২০০৫, বিজয় একাত্তর হল, ঢাকা

amnazib.1997@gmail.com

সূচিপত্র

মেনে নেব আমার এ ঈদ	১৩
আয়না ভাঙার ডাক	১৬
আল মুকাদ্দিমা : অন্যপাঠ	২৫
মিশন জিনুরাইন	২৭
এক ফোঁটা আবেহায়াত	৩৭
শেকড় ভোলার দায়	৩৮
বাইশ জানুয়ারি	৪১
ফিল্যান্সিং	৬৫
সাশ্রু	৬৬
জোছনাফুল	৭০
সূর্যশৌর্য	৯২
নীলমিল	১১৯
কেন সাহিত্য পড়ি	১৩৩
তোমাকে ভালোবাসি কেন	১৩৭
গ্রন্থপঞ্জি	১৪০

মেনে নেব আমার এ ঈদ

ঢাকায় থিতু হওয়ার আগে কবি আল মাহমুদকে আমি চাচা ডাকতাম। ক্লাস সেভেনে অধ্যয়নের সময় আব্বু কিনে দিয়েছিলেন আল মাহমুদের দুটো বই *পাখির কাছে ফুলের কাছে* এবং *মরু মুষিকের উপত্যকা*। এ দুটো পড়ার পর তাঁকে ‘প্রিয় আল মাহমুদ চাচা’ বলে সম্বোধন করে একটা পত্র লিখেছিলাম। কবির বাসার ঠিকানা জানতাম না। বইয়ে সংস্থিত প্রকাশকের ঠিকানায় পত্র পাঠিয়েছিলাম। কতদিন অপেক্ষায় ছিলাম, পত্রের জবাব আসবে! আসেনি। মন খারাপ করছি দেখে আব্বু যথারীতি সান্ত্বনা দিলেন। চিঠিটা হয়তো পৌঁছেনি অথবা পৌঁছেলেও প্রকাশক এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। ফলে কবির কাছে ‘ফরোয়ার্ড’ করেননি বা করতে চেয়ে পরে ভুলে গিয়েছেন। আবার এমনও হতে পারে, কবির হাতেও পৌঁছেছে, কিন্তু উত্তর লেখার সময় পাননি।

এত ‘ইহতিমাল’ শোনার পর দুঃখ জমিয়ে রাখা দায়। অনেকবার ভেবেছিলাম, কবির সাথে সাক্ষাৎ হলেই জিজ্ঞাসা করব— এমন একটা চিঠি আপনি পেয়েছিলেন কি না? কিন্তু সাহস হয়নি। ঢাকায় আসার পর সম্বোধনের ধরন পরিবর্তন করে ‘দাদা’ ডাকতে ইচ্ছে হলো। প্রথমত তিনি আমার দাদার প্রায় সমবয়সি, দ্বিতীয়ত দুজনের নামের মিল। আমার দাদার নাম আবদুশ শাকুর। আল মাহমুদের পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুশ শাকুর। কিন্তু তাঁর সামনে গিয়ে দাদা ডাকার সাহসও হয়নি। শেষ দেখা হয়েছিল ২০১৭-তে। আমার বেশ কিছু অণুকাব্য নিয়ে একটা পাণ্ডুলিপি হলো। এই পাণ্ডুলিপি ছাপার অক্ষরে মলাটবদ্ধ করব কি করব না— সিদ্ধান্তহীনতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা এ দুয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করছিলাম। একবার ভাবলাম, আল মাহমুদ দাদাকে পড়ে শোনাব। তিনি হ্যাঁ বললে সামনে এগোবো।

অগ্রজপ্রতিম শিল্পী তাওহীদুল ইসলাম ভাইয়ার সাথে হাজির হলাম মগবাজারস্থ কবির বাসায়। তাঁর জন্য বিস্কুট আর হরলিক্স নিয়ে এসেছি দেখে মুচকি হাসলেন। তাওহীদ ভাইয়া অনেকগুলো কবিতা পড়ে শোনালেন। আল মাহমুদ তখন চোখে কম দেখেন, কানেও খুব ভালো শুনতে পান না। অনেক বড়ো করে বললে শোনেন। কয়েকটা অণুকাব্য শোনার পর অনুচ্চ স্বরে বললেন— ‘এই কবিতা আবেগে ভাসছে।’ আর কয়েকটা শোনার পর বললেন— ‘কবিতা আবেগে থরথর করে কাঁপছে।’ কাঁপা কাঁপা হাতটা নাড়িয়ে ধীরলয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিলেন। ইতিবাচক সাড়া পেয়ে আমি স্বস্তি পেলাম।

তাওহীদ ভাইয়া অনুরোধ করলেন একটা ছোটো ভূমিকা দেওয়ার জন্য। কবি বললেন। ভাইয়া অনুলিখন করলেন। এই ছোটো লেখাটা আমার জীবনের সেরা পাওয়া। এই একটা ভূমিকা নিছক কিছু শব্দের সমাবেশ নয়, এ আমার গর্বের ধন। শৈশব থেকে দীর্ঘকাল আল মাহমুদ আমার আবেগের জায়গা ছিলেন। ডায়েরিতে চুপিসারে অনেকবার নিজের নাম লিখেছি এভাবে— আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ নজীব। সৌরভের কাছে পরাজিত গল্পগ্রন্থের পাতায় যে অশ্রু আমি ফেলেছি, বখতিয়ারের ঘোড়া কাব্যগ্রন্থের সাথে যে ভাষায় আমি কথা বলেছি, তাকে তরজমা করার সাধ্য পৃথিবীর নেই। যে পারো ভুলিয়ে দাও উপন্যাসের সাথে যে আবেগ আমি মিশিয়ে রেখেছি, কেউ পারবে তা ভুলিয়ে দিতে? আল মাহমুদের জানাজায় জায়গা পেয়েছিলাম বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ বারান্দায়। আধা-নিম্বেজ সূর্যোভাসের নিচে দাঁড়িয়ে সামনে যে আদিগন্ত আকাশ দেখেছি, আমার হৃদয়ে অনুভূত শূন্যতা কি তারচেয়ে বেশি ছিল না?

তঁার মৃত্যুর পর একটা কবিতা সবার মুখে মুখে খুব ছড়িয়েছিল—

‘কোনো এক ভোরবেলা রাত্রি শেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাগিদ
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের অন্ধকারে
ভালো মন্দ যা ঘটুক মেনে নেব এ আমার ঈদ।’

আল মাহমুদের মৃত্যুর পর প্রায় সবাই লিখেছেন, কবি সত্যিই শুক্রবারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখানে সামান্য ভুল আছে। ইসলামি ঐতিহ্যে সন্ধ্যার পর নতুন দিন শুরু হয়ে যায়। এ জন্য দেখা যায়, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকেই শুক্রবারের সুনাত পালন শুরু হয়ে যায়। কবি মৃত্যুবরণ করেছেন শুক্রবার দিবাগত রাতে অর্থাৎ শনিবারে। মৃত্যুর দিনক্ষণ নিয়ে আমার কোনো মনোযোগ নেই। মৃত্যু যেদিনই হোক না কেন, ঈমান ও আমলে সালিহ নিয়ে যেতে পারলে আল্লাহর কাছে পুরস্কার, অন্যথা তিরস্কার। আল্লাহ যেন কবিকে পুরস্কারের উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করেন, আমরা এই দুআ করি।

আমার বিশেষ মনোযোগ ও আগ্রহ ওপরের চারটি পঙ্ক্তির সর্বশেষটি নিয়ে। ‘মেনে নেব আমার এ ঈদ।’ ঈদ শব্দের সাথে আনন্দের দ্যোতনা আছে। মৃত্যু ও বিদায় সাধারণত হৃদয়বিদারণের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি এটাকে ঈদ হিসেবে দেখছেন কেন? পরে ভাবলাম, দেখা তো যায়-ই। মৃত্যু মানে আরেক জীবনের উদ্বোধন। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের মুহূর্ত ঘনি়ে আসার সূচনা। তিনি বিশ্বাসী শিল্পী, অন্ধকার মাড়িয়ে এসে আলোর মিস্বরে দাঁড়ানো সাহসী দীপ্তবাক, আল্লাহর স্মরণ ও শরণে স্থিতধী মানুষ; নতুন জীবনটা তাঁর করুণার ছায়ায় আনন্দে কাটবে— এমন প্রত্যাশা ও স্বপ্ন লালন করাটা খুবই স্বাভাবিক।

এই ভাবনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে আমার আলেকজান্দ্রিয়ান বন্ধু আমিরের একটা খুদে বার্তায়। ঈদ উপলক্ষ্যে সে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে—

اجعل حياتك رمضان، تجد آخرتك عيداً

‘যদি জীবনটা রমজানের মতো কাটাতে পারো, আখিরাতটা ঈদের মতো হবে।’

কী সাংঘাতিক কথা! কয়েক মাস আগে কথাটা তার মুখে শুনেছিলাম। কিন্তু সেবার খুব একটা ভাবান্তর না হলেও এবার দেখি— কথাটা একেবারে কলিজায় গিয়ে লেগেছে। একমাস সিয়াম-সাধনার পর আনন্দের বার্তা নিয়ে ঈদের চাঁদ আসে। আনন্দের দিনটা মূলত তাদের জন্য, যারা পুরো মাস নিয়মানুবর্তী ছিলেন, নিজেকে পরিশীলনের কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন। আল্লাহকে ভয় করে অনেক আনন্দ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখা মানুষেরাই পুরস্কার হিসেবে ঈদের আনন্দ উপহার পান। এই শুদ্ধাচারী মনন যদি সব সময় ধারণ করা যায়, পরিশুদ্ধি ও পরিশীলনের চর্চাটা যদি বাকি দিনগুলোতেও অব্যাহত রাখা যায়; এককথায় জীবনটা যদি রমজানের মতো আল্লাহমুখিতায় যাপন করা যায়, তাহলে জীবনের শেষে আরেকটা বড়ো ঈদ যে অপেক্ষা করছে, তা কি আর বলতে হয়! সেই ঈদটাকেই আমাদের চেনা-জানা পরিভাষায় আখিরাত বলে থাকি। সেই জীবনটা যেন সত্যিই ঈদের মতো হয়, আনন্দোদ্বেল ও প্রশান্তির হয়, স্বপ্ন দেখব। সেই ঈদটা মাটি হয়ে যায়, এমন কিছু যেন না করে ফেলি, সতর্ক থাকব। ভুলবশত যখন করে ফেলি, আল্লাহর কাছে মাফ চেয়ে নেব।

পশ্চিমাকাশে চাঁদ হাসলেই পৃথিবীতে ঈদ চলে আসে।

আল্লাহ! এমন একটা জীবন দাও, যেন চোখের পাতা বন্ধ হলেই স্বপ্নের ঈদটা পেয়ে যাই।

আয়না ভাঙার ডাক

এক

রুমমেট কোথায় যেন বের হবে। ভাবুক মানুষ; আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে আর বিড়বিড় করে বলছে— Mirror is my best friend. When I cry it never laugh. সিনিয়র রুমমেট ব্যাকরণ-নাৎসি। হো হো করে হেসে বললেন— ‘অই হাঁদারাম, লাফ হবে না, লাফস হবে!’ ব্যাকরণের নিয়ম নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি কেবল মুগ্ধ হয়ে ভাবছি, কত গভীর ওর অনুভূতি! আসলেই তো, আয়নার চেয়ে ভালো বন্ধু আর কে আছে? আমি যখন হাসি, আয়নাও হাসে; আমি বিষণ্ণ বদনে তাকালে তাকেও বিষণ্ণই দেখায়। হাসি ও কান্নায় যে সমানভাবে একাত্ম হয়, সে-ই তো আসল বন্ধু। তাদের হাসাহাসির মাঝখানে ছোটো একটা হাদিস নিয়ে নতুন করে ভাবনা জাগে।

নবিজি ﷺ বলেছিলেন— المؤمن مرآة المؤمن অর্থাৎ ‘এক মুমিন আরেক মুমিনের আয়না।’^২ নবিজির কথাগুলো গঠনগত দিক থেকে সৎক্ষিপ্ত, অর্থের দিক থেকে ব্যাপক। তাঁর পবিত্র মুখ-নিঃসৃত কথাগুলোতে রূপক-উপমার ব্যবহার অলংকারের দৃষ্টিকোণে যেমন অর্থবহ, আবেদনের দিক থেকেও অনেক বেশি ভাবক ও প্রভাবক। ঈমানদারদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আয়নার সাথে উপমিত করার মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে অনেকগুলো বার্তা আমাদের দেওয়া হয়েছে।

আয়না কখনো মিথ্যা বলে না। আমি ঠিক যেমন, তেমনটাই আয়নাতে বিম্বিত হয়। চেহারায় কোনো দাগ পড়লে আয়না সেই দাগ লুকাবে না, ঠিক ঠিক দেখিয়ে দেবে। চেহারা যখন নিদাগ থাকবে, আয়নাতেও নিদাগ দেখা যাবে। একজন মুমিনও ঠিক তা-ই। অপর ভাইয়ের গুণ যেমন লুকাবে না, দোষগুলোও তাকে ধরিয়ে দেবে সৌজন্যবোধ বজায় রেখে।

- আয়না কখনো বাড়িয়ে বলে না। আবার কোনো কিছু কমিয়েও বলে না। চেহারায় ব্রণ বা বসন্তের দাগ যদি চারটা থাকে, আয়না কখনোই পাঁচটা বা তিনটা দেখাবে না, চারটাই দেখাবে। পারস্পরিক পরামর্শ প্রদান কিংবা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মুমিনরাও এই গুণের অধিকারী হয়ে থাকে। কারও প্রতি অনুরাগের বশে অতিরিক্ত প্রশংসা যেমন করে না, কারও প্রতি বিরাগের বশে বেইনসাফি সমালোচনাও করে না।
- আমরা যতক্ষণ আয়নার সামনে থাকি, ততক্ষণই আমাদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। আয়নার সামনে থেকে সরে গেলে প্রতিবিম্ব আর থাকে না। অসংখ্য মানুষ এই আয়নার সামনে আসে, কিন্তু তাদের অবর্তমানে আয়না কখনোই পূর্বপরিদৃষ্ট ছবিটা ভাসিয়ে রাখে না। একজনের ছবি

^২. সুনানে আবু দাউদ : ৪৯১৮

আরেকজনকে দেখিয়ে বেড়ায় না। মুমিন ব্যক্তির আচরণও তেমন। কোনো ভাইয়ের কল্যাণকামী হয়ে সংশোধনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে তার কোনো দোষ ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হলে— সরাসরি সাক্ষাতেই তা করে, তার অবর্তমানে বা অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে দোষ বর্ণনা করে না।

- আয়না সব সময় বাহ্যিক দিকটাকেই প্রতিফলিত করে, অন্তর্গত বিষয়ে নাক গলায় না। সামাজিক জীবনচাচরের বেলায় মুমিনরাও একে অপরের প্রকাশ্য বিষয়াদিকেই গুরুত্ব দেয় এবং এর ভিত্তিতেই সম্পর্কের পরিচর্যা করে। তারা আগ বাড়িয়ে কারও মনের খবর খুঁজতে যায় না, কারও অপ্রকাশিত অন্তর্গত ব্যাপারে অহেতুক ধারণা বা মন্তব্য করতে উৎসাহী হয় না।
- আয়নাতে কোনো কিছু ঠিকভাবে বিস্তৃত হয় তখনই, যখন আয়নাটা পরিষ্কার থাকে। একজন মুমিন অপর ভাইয়ের ব্যাপারে সব সময়ই পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও নির্মল অনুভূতির অধিকারী হবে। তাদের অন্তর শুভাকাজক্ষা ও শুভকামনায় নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকবে।

তিনটিমাত্র শব্দ, আবেদন কত ব্যাপক!

একটিমাত্র বাক্য, কত নির্দেশনা ঘনীভূত হয়ে আছে তাতে!

হাদিস পড়ার এই তো মজা!

চলুন, আয়না হই...

দুই

একটা মজার গল্প শোনাতে চাই।

আল-জাহিজ ছিলেন আব্বাসি যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ। সমাজবিজ্ঞানী ইবন খালদুন তাঁর আল-মুকাদ্দিমা গ্রন্থে যে চারটি বইকে ‘আরবি সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো আল-জাহিজের *البيان والتبيين* (আল-বায়ান ওয়া আত-তাবয়িন)।^৭ তাঁর চেহারার গড়ন নাকি সুন্দর ছিল না, কিছুটা বেটপ ও বিকটাকার ছিল। তিনি একদিন আয়না দেখছিলেন আর আয়না দেখার দুআ^৮ পাঠ করছিলেন—

৭. বাকি তিনটি বই : ইবন কুতায়বাহর ‘আদাবুল কাতিব’, আল-মুবাররাদের ‘আল-কামিল’ ও আবু আলি আল-কালির ‘আল-আমালি’। এই চারটি গ্রন্থের কোনোটিই কিন্তু পড়িনি। এখানে নিছক জ্ঞাতব্য হিসেবে উল্লেখ করছি।

৮. এই দুআটি আমরা ছোটবেলা থেকে এভাবেই শুনেছি। কিন্তু দুআটি যে হাদিসে বর্ণিত, তা হাদিসবেত্তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী কোনো কোনো সূত্রে ‘মাওদু’ তথা বানোয়াট হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে, আর কোনো কোনো সূত্রে ‘দইফ জিদ্দান’ তথা খুবই দুর্বল বলে আখ্যায়িত। মুহাদ্দিসদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও বিশুদ্ধসূত্রে বর্ণিত দুআটি আমরা নিচে উল্লেখ করছি; যদিও উভয় বর্ণনায় শব্দপার্থক্য একেবারে নগণ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

দুআটি এই—

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

‘হে আল্লাহ! আপনি আমার আকৃতি যেমন সুন্দর করেছেন, তেমনি চরিত্রকেও সুন্দর করুন।’

এরই মধ্যে বাড়িতে একজন আগন্তকের আগমন ঘটল। দরজায় করাঘাত হতেই আল-জাহিজের ছেলে ছিটকিনি খুলে দিলো। আগন্তক জিজ্ঞাসা করলেন—

‘তোমার বাবা কি বাড়িতে আছেন?’

‘জি, আছেন।’

‘কী করছেন তিনি?’

‘আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিথ্যা কথা বলছেন!’

পিচ্চি হয়তো না বুঝে মজা করেছে। আমাদের সে সুযোগ নেই। আল্লাহ যাকে যে আকার, গঠন ও বর্ণে তৈরি করেছেন, তিনি সেই আকৃতিতেই সুন্দর। সূরা আত-তিন আমরা নিশ্চয়ই ভুলিনি—
‘لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ’ ‘আমি তো মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছি।’

হাসির কথা তো গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মাঝেমাঝে মন খারাপও হয়। সিলভিয়া প্ল্যাথ নামে একজন কবির কথা শুনে থাকবেন। সাহিত্যের ছাত্রদের চেয়ে মনোবিজ্ঞানের ছাত্ররা সম্ভবত তাঁকে বেশি চেনেন। Mirror নামে সিলভিয়া প্ল্যাথ-এর বিখ্যাত একটা কবিতা আছে। আমরা এতক্ষণ আয়নার যেসব বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, তার কয়েকটা এই কবিতায়ও আছে। কবিতার উদ্দীপক অনেকটা এমন—

‘একজন নারী তার তারুণ্যে যে আয়না ব্যবহার করেছেন, বার্ধক্যেও তিনি একই আয়নায় স্থিত। যে আয়না চঞ্চলা কিশোরীকে দেখেছিল, সেটাই দিন গড়িয়ে একজন বৃদ্ধাকে দেখছে, কিন্তু তার কোনো ভাবান্তর নেই। কিশোরীর হাসি বা কান্নায় আয়নার কিছু যায়-আসে না। তরুণী ভালোবাসায় উচ্ছল, কিন্তু আয়নার কোনো প্রেম নেই। প্রৌঢ়া তার বার্ধক্য নিয়ে চিন্তিত, কিন্তু আয়নার কোনো সহমর্মিতা অথবা সমবেদনা নেই। অনুভূতিশূন্য এই জড় পদার্থ তবুও মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ; নিজেকে দেখতে হলে এই আয়নার কাছেই মানুষকে আসতে হয়। জীবনকে দেখতে হয় একটা নিজীব বস্তুর চোখে। আহারে জীবন!

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي ، فَأَحْسِنْ خُلُقِي

(আল্লাহুমা আহসানতা খালকি, ফা-আহসিন খুলুকি)

‘আল্লাহ, আপনি আমার গড়ন সুন্দর করেছেন, আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।’ আহমাদ : ২৪৩৯২

ভদ্রমহিলা কবি হিসেবে যথেষ্ট সম্ভাবনাময়ী ছিলেন, ছিলেন পুরোদস্তুর সংসারি। একজন সন্তান এসেছিল তার কোল আলো করে, কিন্তু জীবন ছিল সংজ্ঞায়িত-অসংজ্ঞায়িত নানাবিধ বিষণ্ণতায় ভরপুর। বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা আর বেঁচে থাকেনি। আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন শেষমেশ। পৃথিবীতে এমন কবি সম্ভবত খুব কমই আছেন, যিনি বিষণ্ণতার ঝড়ে আক্রান্ত হননি। ভাবনার মহাসাগরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বেদনার নোনা জল পিয়ে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা তাদের এতই চরমে পৌঁছায় যে, বেঁচে থাকাটা অনেক সময় অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। উর্দু কবি তকি মির তো এক পর্যায়ে বলেই ফেলেছেন— ‘খওফ কায়ামত কা যেহি হ্যায় কি মির/হামকো জিয়া বারে দিগার চাহিয়ে। কিয়ামতকে এ জন্যই ভয় পাই হেইমর/আমাকে যে আবার বেঁচে উঠতে হবে!’ তার মানে— মরে গিয়েও শান্তি নেই, ফের পুনরুজ্জীবিত হয়ে অনন্তকাল বাঁচতে হবে— এটাও তাঁর কাছে ভয়ের বিষয়। কারণ, ওটাও যে আরেকটা জীবন!

জীবনের ব্যাপারে চরম হতাশায় পৌঁছা কবিদের অবস্থান মিরের দুই পঙ্ক্তিতেই ভালোভাবে বিবৃত। আমার ধারণা, সব কবির জীবনেই বেদনা থাকে। পার্থক্য শুধু এই— কেউ বেদনাবিষ পান করেন, কেউ বেদনাফুলের সুভাস নেন। কবিতার সাথে ছোটোখাটো সংসার পেতে আমিই তো কত রং-বেরঙের বিষাদ পুষেছি ভেতরে! এইসব বিষাদের বেশিরভাগই অব্যাখ্যেয় ও অসংজ্ঞায়িত। ফলে এর প্রতিষেধকও অচেনা অথবা অধরা। ভরা বসন্তে দাঁড়িয়েও জীবনকে অর্থহীন মনে হয়েছে কতবার, হিসাব নেই। বিষণ্ণ অবস্থায় নিষণ্ণ হয়েছি কত রাত, ইয়ত্তা নেই।

এমনই কোনো বিষাদগ্রস্ত দিনে আমার প্রিয় কথাশিল্পী আদহাম শারকাওয়ারি একটা লেখা চোখে পড়ে। বড়োসড়ো ধাক্কা খাই তাতে। সেই লেখায় তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা আমার ভাষায় যদি বলি—

কুরআনে এসেছে— ‘আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।’^৫ এই আয়াতটি আল্লাহর রাহে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রেরণা জোগায়, আবার জীবন যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তাকে ভালোবাসতেও শেখায়। ইহজীবন ও পরজীবনের সমস্ত সাধ-স্বপ্নের মধ্যে জান্নাত সবচেয়ে বেশি আরাধ্য, আকাঙ্ক্ষিত ও প্রার্থিত। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সেই অমূল্য জান্নাতের বিনিময় হলো

৫. পূর্ণ আয়াত—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ فَاسْتَبَشِّرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

‘আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, (শত্রুকে) হত্যা করে ও (নিজেরা) নিহত হয়। এটা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (বর্ণিত) আল্লাহর সত্য ওয়াদা। আর আল্লাহর চেয়ে বড়ো ওয়াদা পূরণকারী কে আছে? অতএব, তোমরা তোমরা যে সম্পদ বিক্রয় করেছো তাতে সন্তুষ্ট থাকো, ওটাই বড়ো সাফল্য।’ সূরা আত-তাওবাহ ৯ : ১১১

আমাদের জীবন। যে জিনিস জান্নাতের বিনিময় হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেটা কত বেশি দামি আর মূল্যবান! এই অমূল্য জিনিসকে অবহেলা করো না।

যতবার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগে, খামখেয়ালির প্রবর্তনায় যতবার জাগে নিজের প্রতি অযত্নের অভিলাষ, ততবার শারকাওয়ার কথাগুলো মনে দাগ কাটে। কথাগুলো ভাবলেই মনে হয়— এত দামি একটা জীবন পেয়েছি, কদর করি। মনে হয়— জীবনের প্রতি আরেকটু সদয় হই, আরেকটু ভালোবেসে যত্ন নিই তার। ঔদাসীনের গায়ে পড়ে নির্মম চাবুক, ভঙ্গুর হওয়ার সাধ নষ্ট হয় অঙ্কুরে এবং এভাবে চিন্তা করলে সত্যিই জীবনটাকে অবহেলা করার ইচ্ছা আর জাগে না।

কী এক গ্রন্থ তুমি পাঠালে প্রভু! ভেবেছিলাম, এই গ্রন্থ পড়ে পরকাল পার হওয়ার রোডম্যাপ শিখে নেব, কিন্তু এ তো দেখছি ইহজীবনটাও সোজা করে ছাড়ছে!

জীবনকে ভালোবাসার জন্য প্রিয় নবিজ ﷺ শিখিয়ে দিলেন আরেকটা সুন্দর উপায়। তিনি বলছেন—

যখন তোমাদের কারও জীবনে দুঃখ-বিপদ নেমে আসে, অতিষ্ঠ হয়ে মৃত্যু কামনা করো না। যদি একান্ত মরে যেতেই ইচ্ছে করে, সে যেন আল্লাহকে বলে—

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي

আল্লাহ! আমার জন্য যতদিন বেঁচে থাকা কল্যাণকর, ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমার জন্য যখন মরে যাওয়া কল্যাণকর, তখন আমাকে মৃত্যু দিন।^৬

এই হাদিস পড়তে গিয়ে আমি নবিজকে নতুন করে আরেকবার ভালোবেসেছি, হাদিসের প্রতি নতুন করে মোহিত হয়েছি। কী আশ্চর্য! জীবনের সাথে পেরে না উঠে মানুষ কখনো কখনো মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করতে চায়, এই জিনিসটাও হাদিসে অনালোচিত থাকেনি। মৃত্যুকামনা মানুষের মনে আসতে পারে, এই বাস্তবতাকে নবিজ ﷺ উপলব্ধি করেছিলেন; দুঃখ-বেদনা মানুষের জীবনে অসহ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে, এই সত্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি।

আত্মহননের ইচ্ছা পোষণকারীকে নিয়ে তিনি হাসাহাসি করেননি, পাগল বা শয়তান বলে ত্যাগিল্য করেননি, যা কিনা আমরা অহরহই করে থাকি। হাদিসটা পড়তে গিয়ে মনে হলো— তিনি একজন দক্ষ ও দয়ালু চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ, যেন আমার কাঁধে মমতার হাত রেখে বলছেন— ‘ভেঙে পড়ো না, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে; তাঁকে ডাকো। দেখবে, তোমার বিষণ্ণতার নীলগুলো তাঁর করুণার নীলিমায় মিশে যাবে। জীবনের স্রষ্টা যিনি, জীবনের মালিকানা তো তাঁরই! তাঁর ইচ্ছার কাছেই নিজেকে সঁপে দাও। দেখবে, জীবনটা কবিতার মতোই সুন্দর হয়ে যাবে। তাঁর নির্ভরতায় তুমি নির্ভর হবে, আমি কথা দিচ্ছি। হাত তোলো দেখি!’

দুআটা কত সুন্দর, তা লিখে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য শুধু নয়, রীতিমতো অসাধ্য। নিমগ্ন বিষণ্ণতায় যখন ঝরাপাতার গান বাজে মনের চাতালে, তখন দুআটা উচ্চারণের মাঝে কী অপরিমেয় প্রশান্তি বিরাজ করে, নিজে কখনো অনুভব করলেই ঠিকঠাক বোঝা যাবে হয়তো।

এই যে জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছুতেই সপ্রিত নির্দেশনা পাই তাঁর, এই যে হৃদয়ের এত কাছাকাছি এসে কথা বলেন তিনি, এ জন্যই তো তিনি আমাদের ‘উসওয়াতুন হাসানাহ’। সর্বোত্তম আদর্শ।

চলুন, জীবনকে ভালোবাসি...

তিন

লেখাটা এখানেই শেষ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু মাথায় গালিব-ইকবাল ঘুরছেন। আয়নাঘরে তাদের একটু জায়গা দিই। আমার মুখে এদের শের শুনতে শুনতে প্রিয়জনেরা ইতোমধ্যে বিরক্ত। আজ নাহয় পাঠকদের বিরক্ত করি।

মির্জা গালিব কী অসাধারণ বলেছেন!

‘উমর ভর গালিব ওহি গলতি করতা রাহা
ধুল চ্যাহরে পে থি ঔর আইনা সাফ করতা রাহা।’

আমরা কাব্যানুবাদের চেষ্টা করছিলাম এভাবে—

‘গালিব, তুমি তো সারাটি জীবন করে গেলে একই ভুল
চেহারার ধুল না মুছে মুছেছো শুধু আয়নার ধুল।’

গালিব এ কথা বলে কোনদিকে ইঙ্গিত করেছেন কে জানে! এমনতেই তিনি কাব্যমোদীদের কাছে ‘মুশকিলপসন্দ’ (জটিলতাপ্রিয়) কবি বলে খ্যাত। জটিল রূপক-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করেন, কবিতার ভাঁজে ভাঁজে রহস্য জিইয়ে রাখেন। তাঁর এক কবিতা পাঁচজনের ব্যাখ্যায় পাঁচভাবে চিত্রায়িত হয়। হতে পারে— আয়না বলতে তিনি অন্যদের বুঝিয়েছেন। জীবনভর অন্যের দোষ দেখে ও দেখিয়ে গেলাম, নিজের দোষ নিয়ে কখনো ভাবিনি। আয়না বলতে তিনি হৃদয়কেও বুঝিয়ে থাকতে পারেন। ফরাসি-উর্দু কবিতাগুলোতে হৃদয়ের রূপক অথবা প্রতীক হিসেবে আয়নার ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে আধ্যাত্মিক ঘরানার কবিতাগুলোতে এর সাক্ষাৎ মেলে। আয়না যেমন অস্বচ্ছ হলে সেখানে কোনো কিছুর প্রতিবিম্ব ঠিকমতো পড়ে না, আলো প্রতিসরিত হয় না; তেমনি বান্দাহর হৃদয়ও যখন কদর্য-অপরিচ্ছন্ন হয়, তখন আল্লাহপ্রদত্ত হিদায়াতের আলো তাতে প্রতিফলিত হয় না। এ জন্য কাচ পরিষ্কারের মতো কলব তথা হৃদয় পরিষ্কারের প্রতি তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। খুব দরকারি পরামর্শ, সন্দেহ নেই।^৭

৭. কুরআনেও বলা হয়েছে— কিয়ামতের দিন সম্ভান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ কোনো উপকারে আসবে না, কেবল পরিশুদ্ধ অন্তর (কুরআনের ভাষায় قلوب سليمة – কালবুন সালিমুন) নিয়ে উপস্থিত হতে পারলেই মুক্তি মিলবে।

গালিব কি তাহলে বোঝাতে চাচ্ছেন যে অন্তর সাফ করার প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে তিনি বাহ্যিক দিকটাকে সাজানোর সুযোগ পাননি? একদিক থেকে মনে হবে- না। কারণ, আধ্যাত্মিকতার দিকে গালিবের অভিনিবেশ ছিল না। অন্যদিক থেকে মনে হবে- হ্যাঁ। কারণ, কবি সব সময় নিজের মুখে নিজের কথাই বলেন না; বরং সমাজের অপরাপর সদস্য ও গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়ে তাদের অনুভূতি ও অভিব্যক্তি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন।

আয়না শুধু হৃদয়ের প্রতীক হিসেবেই আসেনি; কখনো কখনো চোখের প্রতীক হিসেবেও এসেছে।

আল্লামা ইকবাল বলছেন-

‘তু বাচা বাচা কে নারাখ ইসে, তেরা আয়না হ্যায় ও আয়না
কে শিকাস্ত হো তো আজিজ তার হ্যায় নিগাহে আয়না সায মেঁ।’

আহা, ইকবাল! আমার ইকবাল!

অনুবাদের ব্যর্থ চেষ্টা-

‘এই আয়নাটা যাক ভেঙে যাক, বাঁচিয়ে রেখ না তাকে,
আয়নার প্রভু ভাঙা আয়নাই পছন্দ করে থাকে।’

চোখ মনের কথা বলে। ব্যক্তির হৃদয় চোখের চাহনিতেই অনেকটা বিস্তৃত হয়। এ জন্য চোখকে আয়নার সাথে তুলনা করা হয়। হাত থেকে পড়ে আয়না ভেঙে গেলে আমাদের সাধারণত মন খারাপ হয়, কিন্তু ইকবাল বলছেন, এই আয়না বিচূর্ণ হলে মন খারাপ করা যাবে না। চোখ নান্নী আয়না যদি ভেঙে যায়, অর্থাৎ অশ্রুপাত করতে থাকে, অশ্রুর প্রবাহে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই; আল্লাহর কাছে এই অশ্রু অনেক দামি, ভীষণ পছন্দের।^৮

ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলছিলেন- *وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة ففحطت عينك بها* - ‘আল্লাহ সাত সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তোমার এক ফোঁটা অশ্রুকে বেশি পছন্দ করেন তিনি। অথচ তোমার চোখ শুকিয়ে খরা।’^৯ এই খরা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা তুমি করো? তাঁর প্রিয় জিনিসটা তাঁকে ভালোবেসে নিবেদন করার ইচ্ছে তোমার জাগে?

চলো, আয়না ভাঙি...

^৮ এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস-

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين؛ قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران: فأنثر في سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله

“আল্লাহর কাছে দুইটি ফোঁটা এবং দুইটি দাগ সবচেয়ে প্রিয়, এরচেয়ে প্রিয় তাঁর কাছে আর কিছু নেই।

দুইটি ফোঁটার একটি আল্লাহর ভয়ে বিগলিত অশ্রুফোঁটা, আরেকটি আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত রক্তের ফোঁটা।

আর দুইটি দাগের একটি হলো আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের মাঠে শরিক হওয়ার কারণে) সৃষ্ট জখমের দাগ, আরেকটি হলো আল্লাহর দেওয়া কোনো ফরজ বিধান পালন করতে গিয়ে সৃষ্ট ছাপ।’ তিরমিজি : ১৬৬৯

^৯ আল-ফাওয়াইদ, পৃ. ৭৮